নির্বাচিত সাহিত্য প্রবন্ধ

[মাইকেল-বঙ্কিম-রবীন্দ্র-শরৎ-তারাশঙ্কর ও অন্যান্য]

নির্বাচিত সাহিত্য প্রবন্ধ

মাইকেল-বঙ্কিম-রবীন্দ্র-শরৎ
তারাশঙ্কর ও অন্যান্য

শাফিক আফতাব

অনিন্দ্য প্রকাশ

প্রথম প্রকাশ
মাঘ ১৪২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১

প্রকাশক
মোঃ আফজাল হোসেন
অনিন্দ্য প্রকাশ
৩৮/৪, পি. কে. রায় রোড, বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট (৩য় তলা), ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৭৯৬৪, ০১৯৭১৬৬৪৯৭০, ০১৭১১৬৬৪৯৭০

বর্ণবিন্যাস
আদিত্য কম্পিউটার
১৪২, হৃষিকেশ দাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৯১৯৬৬৪৯৭০

বানান সমন্বয়ক
মো : রফিকুল ইসলাম
মোবাইল : ০১৯১২১৯৮০২৩

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রচ্ছদ : চারু পিন্টু

মুদ্রণ
অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস
৩০/১ক, হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯৫৭৩৭৬৯, ০১৭১১৬৬৪৯৭০

মূল্য : ৩৫০.০০ টাকা

Nirbacito Shahitto Probondho by **Shafiq Aftab**
Published by Md. Afzal Hossain
Anindya Prokash
38/4, P. K. Roy Road, Banglabazar
Mannan Market (2nd Floor), Dhaka-1100
Phone : 47117964, 01971664970, 01711664970
e-mail : anindya.prokash@yahoo.com

First Published : February 2021

Price : 350.00
US $ 20

ISBN 978 984 95422 3 0

ঘরে বসে অনিন্দ্য প্রকাশ-এর বই কিনতে ভিজিট করুন
http://rokomari.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ১৬২৯৭
https://othoba.com ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১৩৮০০৮০০
http://boibazar.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১১২৬২০২০
http://bdshopay.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৬২২৭৭৮৮৭৭
http://porua.com.bd/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৮৫৭৭৭৭৪৮৪
http://journeybybook.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে

০১৬৭৪৫৩৬৫৪৪

উৎসর্গ

প্রতিনিধিত্বশীল তরুণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব
মাতুয়াইল হাজী আব্দুল লতিফ ভূইয়া বিশ্ববিদ্যালয়
কলেজের গভর্নিং বডির সভাপতি
জনাব মো. আব্দুল রাকিব ভূইয়া (ভূইয়া বাবু)
এর করকমলে

সূচিপত্র

মাইকেল মধুসূদন দত্তের নাটক : বিষয় ও নাট্যরীতি ৯
বঙ্কিমচন্দ্রের *দেবী চৌধুরাণী* : অবশেষে মানুষ ১৯
রবীন্দ্র-উপন্যাসে নারী : ভিন্নতা ও নান্দনিকতা ৩৮
দীনবন্ধু মিত্রের নাটক : দ্রোহের বীজমন্ত্র ৪৪
বাংলা উপন্যাসে নারী রূপায়ণের ক্রমধারা ৫২
শরৎচন্দ্রের উপন্যাস : প্রথা বিদ্রোহ ও মানবাত্মার জয়গান ৬২
জীবনানন্দ দাশ : প্রকৃতি ও বিশ্বলোকের রূপকার ৭৯
ক্রীতদাসের হাসি : প্রাসঙ্গিক পাঠ ৯৪
সিকান্দার আবু জাফরের *সিরাজউদ্দৌলা* : প্রেক্ষাপট ও চরিত্রায়ণ ৯৮
তিতাস একটি নদীর নাম : ব্রাত্য জীবনধারার অনন্য আলেখ্য ১১৮
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : শিল্পস্বরূপ ও *গণদেবতা* ১২৩
কপালকুণ্ডলা ও *কৃষ্ণকান্তের উইল* : আখ্যানবিন্যাস ও অন্যান্য ১৩৪
শাহাদুজ্জামানের উপন্যাস : স্বতন্ত্র স্বরের ক্যানভাস ১৪৪
শওকত আলীর গল্প : জীবনের বহুমাত্রিক রূপায়ণ ১৫০
ছোটগল্প : রূপকল্প ও কালান্ড়রে রূপ ১৫৮
রিজিয়া রহমান : উপন্যাসের ভাষা ১৬৭
সৈয়দ শামসুল হকের উপন্যাস : মধ্যবিত্তের আলেখ্য ১৭৯
আব্দুল্লাহ আল-মামুন : বিরলপ্রজ নাট্যকার ১৮৭

মাইকেল মধুসূদন দত্তের নাটক : বিষয় ও নাট্যরীতি

বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক নাট্যকার মাইকেল মধুসূদন দত্ত। কিন্তু তিনি নাট্যকার হতে চাননি। তিনি হতে চেয়েছেন মহাকবি। সেটা তিনি হয়েছেন। নাটক লিখেছেন ঝোঁকের মাথায়। সমকালে নাটকের লাজুক অবস্থা দেখে তিনি আধুনিক নাটক লেখার তাড়না অনুভব করেন। তার ফলশ্রুতিতে তিনি নাটক লেখা শুরু করেন। অনেক গবেষক ও সমালোচক তাঁর সাহিত্য প্রতিভা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। সত্যি কি এমন মেধার মানুষ পৃথিবীতে জন্মায়? সাহিত্যের যে কটি শাখায় তিনি হাত দিয়েছেন সেখানেই নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন। তাঁর নাট্য প্রতিভা নিয়ে গবেষকের মন্তব্য উদ্ধৃত ও বিশ্লেষণ করা যায় :

> মধুসূদন নাটক লেখেন একেবারে ঝোঁকের মাথায়। ১৮৫৮ সালে শর্মিষ্ঠা লিখে ঝোঁক থাকতে থাকতেই লিখে ফেলেন 'পদ্মাবতী' (১৮৬০) ও 'কৃষ্ণকুমারী' (১৮৬১)। ১৮৬০ সালে আরও লিখলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন মেজাজের দুটি প্রহসন নাটক : 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' ও 'একেই কি বলে সভ্যতা'। তারপর সম্ভবত ঝোঁকের পরিসমাপ্তি ঘটে এবং নাটকে মধুসূদনেরও ঘটে পরিসমাপ্তি। এরপর জীবনের শেষপ্রান্তে এসে (১৮৭৩) যখন তিনি নিজেই পরিণত হয়েছেন ট্র্যাজেডির এক মহানায়কে, তখন তিনি 'মায়াকানন' ও 'বিষ না ধনুর্গুণ' নামক দুটি নাটক লেখায় হাত দিয়েছিলেন। কিন্তু অসুস্থ শরীর নিয়ে কোনোরকমে মায়াকানন লেখা শেষ করেছিলেন। মায়াকাননে মধুসূদনের অসাধারণ প্রতিভার অস্তড়রূপটাই শুধু প্রমাণিত হয়। বিষ না ধনুর্গুণ এই প্রশ্নবোধক নাটকটি তিনি শেষও করে যেতে পারেননি। ততদিনে তাঁর অমূল্য জীবনটাই যে নানরকম 'বিষ ও ধনুর্গুণ'-এ জর্জরিত

হয়ে গেছে।

এই যে মাত্র কয়েকখানি নাটক ও প্রহসন লিখলেন, তার বিষয়বস্তুর দিকে লক্ষ করলে দেখা যায়, তিনি কার্যত নিজের বির"দ্ধে নিজে দাঁড়িয়ে গেছেন। প্রথমে বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ-এর বিষয়বস্তুর দিকে নজর দেওয়া যাক। এই প্রহসনে তিনি যে গ্রাম্য সম্পদশালীদের লাম্পট্য তুলে ধরলেন, সে অভিজ্ঞতা তাঁর কোথায় হয়েছিল, নির্দিষ্ট করে তা বলা মুশকিল। তবে তিনি নিজে ছিলেন ওই ধরনের একটি ধনাঢ্য পরিবারের সন্তড়ান এবং ওই ধরনের অনেক 'বুড়ো শালিকদের' সাথে তাঁদের পরিবারের ওঠাবসাও ছিল। যাই হোক, তিনি যে বাবুশ্রেণির লোক ছিলেন, এই প্রহসনে সেই শ্রেণিটার বির"দ্ধেই তিনি অবস্থান নেন। একেই কি বলে সভ্যতা?-এর পটভূমি তৎকালীন কলকাতার ইংরেজি শিক্ষিত নব্য ছেলেরা। বিশেষত তিনি নিজেও ছিলেন ওই ধরনের একজন 'ইয়ং বেঙ্গল' যুবক। কিন্তু প্রহসনে তিনি নিজের ও ইয়ার বন্ধুদের এই নব্য আধুনিকতার তীব্র ব্যঙ্গ করলেন। এ হলো মধুসূদনের নিজের বির"দ্ধে নিজে অবস্থান নেওয়ার আরেকটি দৃষ্টান্ড়। এরকম আরও দৃষ্টান্ড় রয়েছে। তিনি হিন্দুধর্ম ত্যাগ করেছিলেন, জীবনেও আর পূজাপার্বণের ধারেকাছে যাননি। কিন্তু হিন্দু ধর্মগ্রন্থ আর পুরাণ ত্যাগ করতে পারেননি কখনো। বরং এসব পুরাণের নতুন নতুন দিক উন্মোচন করে তিনি যেন পরিণত হন আধুনিক এক পুরাণাকারে। শর্মিষ্ঠা নাটকের কাহিনি নিয়েছিলেন মহাভারত থেকে। 'পদ্মাবতী' নাটকটির সাথে কোনো হিন্দু পুরাণের মিল নেই, তবে এটি পড়লে মনে হয় নতুন আরেকটি মিলনাত্মক পৌরাণিক কাহিনি পড়ছি। এই পদ্মাবতী আরেকটি কারণে গুর"ত্বপূর্ণ। এই নাটকেই তিনি প্রথম অমৃতাক্ষর ছন্দের ব্যবহার করেন। এরপর লিখলেন বিয়োগাত্মক নাটক, বাংলা ভাষার প্রথম সার্থক ট্র্যাজেডি 'কৃষ্ণকুমারী'। এটি শুধু ট্র্যাজেডি ছিল তা নয়, বাংলা ভাষায় এটিই প্রথম ঐতিহাসিক নাটক।

বিলেতে যাওয়ার আগের মাত্র বছর তিনেকই হয়ে থাকল মধুসূদন দত্তের নাট্যকারের জীবন। সত্যিকার অর্থে দক্ষ নাট্যকার হয়ে

উঠেই তিনি নাটক থেকে দূরে সরে যান। কারণ, ব্যারিস্টার হতে হবে। কিন্তু কত ব্যারিস্টারই তো এলো গেল, কী দরকার ছিল মধুসূদনের ব্যারিস্টারি পড়তে যাওয়ার! প্রতিভার এমন খেয়ালি অবহেলা আমাদের বড় ব্যথিত করে। (তথ্যসূত্র : দিব্যদ্যুতি সরকার, মাইকেল মধুসূদন দত্তের নাটক, দৈনিক ইত্তেফাক, ২২শে জানুয়ারি, ২০১৬)

মূলত মাইকেল মধুসূদন দত্ত ঝোঁকের মাথায় বাংলা নাট্যাঙ্গনে প্রবেশ করেন এবং নিজের সক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করে প্রস্থান করেন। তাঁর নাটকের বিষয়বস্তু মানবতার বোধের আখর। তাঁর নাটকের বিষয়বস্তু ও জীবনদর্শন অনেকটাই নিজের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। মধুসূদনের সাহিত্য ও নাট্য প্রতিভা সম্বন্ধে জনৈক গবেষক যে তথ্য উদ্ধার করেছেন তা উদ্ধৃত করলে আমরা তাঁর বিস্ময়কর প্রতিভার পরিচয়ের সম্যক ধারণা পাব। প্রসঙ্গত :

> বাংলা নাট্যসাহিত্যের পিতৃপুরুষ বলে কাউকে যদি চিহ্নিত করতে হয় তবে নিশ্চিতভাবেই তিনি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। অথচ মধুসূদন কখনো বাংলা সাহিত্যের জন্য কলম ধরবেন তা তাঁর অতিবড় বন্ধুও ভাবনায় আনেননি। সেই আদিযুগের বাংলা ভাষার প্রতি মধুসূদনের বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না। প্যারিচাঁদ মিত্রর (টেকচাঁদ ঠাকুর) চলিত ভাষায় লেখা প্রথম বাংলা উপন্যাস পড়ে মধুসূদন বলেছিলেন 'এরকম ভাষায় জেলেরা কথা বলে, যদি না তুমি সংস্কৃত থেকে ভাষা গ্রহণ করো' (It is the language of the fishermen, unless you import largely from Sangskrito)। প্রবল আত্মবিশ্বাসে মধুসূদন বলেছিলেন, 'দেখবেন আমি যে ভাষা সৃষ্টি করব তাই-ই চিরস্থায়ী হবে'। উপস্থিত সকলে বিদ্রুপ করেছিলেন কারণ তৎকালীন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি মধুসূদনের কিছুমাত্র অনুরাগ ছিল না। তাঁর সৃজনাকাঙ্ক্ষী মনন তখন দখল করেছে ইংরেজি ভাষা আর শেকসপিয়র, বায়রন, শেলির মতো হওয়ার আর শেকসপিয়র, বায়রনের দেশে পা রাখার প্রবল বাসনা। সেই সময়, হিন্দু রক্ষণশীলতার বাধায় বিলেত যাওয়া সহজ ছিল না, জাতিচ্যুত হতে হতো। সেই বাধা অতিক্রম করতে উনিশ বছর বয়সে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করলেন এবং

আত্মীয়-পরিজন পরিত্যক্ত হয়ে নিঃসঙ্গ মধুসূদন এক তামিল সহপাঠীর সাহায্যে মাদ্রাজ চলে গেলেন ১৮৪৭-এর শেষের দিকে। মধুসূদনের আট বছর মাদ্রাজ প্রবাসকালে কলকাতায় আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ ছিল না। এমনকি পিতামাতার মৃত্যুসংবাদও পাননি। সকলেই ধরে নিয়েছিলেন মধুসূদন মৃত। পৈতৃক সম্পত্তিও আত্মীয়-পরিজনদের দ্বারা বেদখল হয়ে যায়। এই সংবাদ পেয়ে মধুসূদন কলকাতায় ফিরে আসেন। মধুসূদনের আট বছরের মাদ্রাজ প্রবাসজীবনে মোটেই সুস্থিতি ছিল না। কিছুকাল শিক্ষকতা, সংবাদপত্রে সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ এবং সংবাদপত্র প্রকাশনা ও সম্পাদনা করেন। ১৮৪৯-এ মাদ্রাজে-এ শিক্ষকতা করার সময় ঐ স্কুলেই অধ্যয়নরতা রেবেকা ম্যাক্টাভিলকে বিবাহ করেন। কয়েকবছর পরে ১৮৫৫-তে রেবেকার সঙ্গে তাঁর বিবাহবিচ্ছেদ হয়। মধুসূদন তখন দুই পুত্র ও দুই কন্যাসন্তানের জনক। ওই বছরের ডিসেম্বরে ফরাসি মহিলা এমিলিয়া হেনরিএটা সোফিয়াকে বিবাহ করেন। ইতোমধ্যে মাদ্রাজে পত্রপত্রিকায় ইংরেজি কবিতা ও প্রবন্ধ লিখে সুখ্যাতি অর্জন করেন মধুসূদন। মাদ্রাজ প্রবাসকালেই তাঁর প্রথম গ্রন্থ প্রকাশিত হয় 'ক্যাপটিভ লেডি'। বইটি পড়ে তাঁর সাহিত্যকৃতিতে মুগ্ধ হয়ে ভারতপ্রেমিক শিক্ষাবিদ ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন মতপ্রকাশ করেন যে এই সাহিত্যপ্রতিভা তাঁর মাতৃভাষায় নিয়োজিত হলে সেই সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে। বাল্যবন্ধু গৌরদাস বসাক বেথুনের প্রশংসা মধুসূদনকে জানিয়ে এক পত্রে লেখেন— 'আমরা ইংরেজি সাহিত্যে আর একজন বায়রন কিংবা শেলি চাই না, আমরা চাই বাংলা সাহিত্যে একজন বায়রন কিংবা শেলি।' বেথুনের প্রশংসা ও গৌরদাসের পত্র মধুসূদনকে বাংলা ভাষায় সাহিত্যচর্চার প্রত্যয় জাগিয়েছিল। ১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দের দোসরা ফেব্রুয়ারি সকালে প্রায় রিক্ত হাতে মধুসূদন কলকাতায় ফিরে এলেন, হিতৈষীদের সহায়তায় পুলিশ কোর্টে কেরানির পদে একটি কাজ পেলেন। মধুসূদনের বয়স তখন বত্রিশ। (পূর্বোক্ত)

মধুসূদনের জীবন যেমন বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ তেমনি সীমাহীন ট্র্যাজেডিতে আক্রান্ত। যে সময় ও সমাজব্যাবস্থায় তিনি সাহিত্য রচনা করেছেন

সেই সময়টা তথ্যপ্রযুক্তি ও আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানে পরিপূর্ণ ছিল না। বাংলা সাহিত্যও সৃষ্টিসম্ভারে প্রতুল ছিল না। তিনি সাহিত্য রচনার জন্য ভাষা সৃষ্টি করেছেন, তেমনি আঙ্গিকবৈচিত্র্য ও বিষয়ভাবনায় ছিলেন স্বতন্ত্র স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে প্রোজ্জ্বল। আধুনিক কবিতা শুধু নয়, সার্থক মহাকাব্য এবং সার্থক নাটক তাঁর হাতেই সৃষ্টি। এমন অমিত মেধার মানুষটিকে শেষ জীবনে অনাহারে অর্ধাহারে দিনাতিপাত করতে হয়েছে। আমরা তাঁর ব্যক্তিজীবনের নিদারুণ কষ্টের কাহিনি বলতে চাইনে, জীবনীগ্রন্থে না হয় সেদিকগুলো আলোকপাত করা যাবে। মধুসূদনের নাট্যদ্রোহ যে কত বিশাল তা জানা যাবে, গবেষকের উদ্ধৃতিতে :

> মধুসূদন শুধু বাংলা মঞ্চের জন্য সার্থক নাটক রচনা করেই থেমে থাকেননি। বাংলা থিয়েটারের সেই উষালগ্নে থিয়েটার পরিচালনায় আধুনিকতা আনা বা সংস্কারের ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন নিরলস। ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দের ৬ই ডিসেম্বর দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ অভিনয়ের মধ্য দিয়ে পথ চলা শুর করেছিল আমাদের প্রথম সাধারণ রঙ্গালয়। জমিদারদের বাগানবাড়ি থেকে সরিয়ে নিয়ে সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা হলো থিয়েটারের দরজা। টিকিট কিনে নাটক দেখার শুর সেদিন থেকেই। পরের বছর গোড়ার দিকে ধনকুবের আশুতোষ দেব ওরফে ছাতু বাবুর দৌহিত্র শরৎচন্দ্র ঘোষ ৯ নম্বর বিডন স্ট্রিটে প্রতিষ্ঠা করলেন কলকাতার প্রথম স্থায়ী নাট্যশালা 'বেঙ্গল থিয়েটার'। সুচারভাবে থিয়েটার পরিচালনার জন্য একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হলো। এই কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রমুখেরা।
>
> শরৎচন্দ্র ঘোষ তখন মধুসূদনকে বেঙ্গল থিয়েটারের জন্য নাটক লিখে দিতে অনুরোধ করলেন। মধুসূদন সম্মত হলেন দুটি নাটক লিখে দিতে। শর্ত জুড়ে দিলেন, "নাটকে যে নারীচরিত্রগুলো রয়েছে সেগুলো নারী অভিনেত্রী দিয়েই অভিনয় করাতে হবে।" এর আগে নাটকে নারীচরিত্রে পুরষ অভিনেতারাই অভিনয় করতেন। 'শর্মিষ্ঠা' নাটকে বা সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রথম নাটক 'নীলদর্পণ'-এ পুরষ অভিনেতারাই নারীচরিত্রগুলো রূপায়িত

> করেছিলেন। থিয়েটারে অভিনেত্রী নিয়োগের প্রস্ড়াবে বেঙ্গল থিয়েটারের উপদেষ্টা কমিটির সভায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো মানুষও বিরোধিতা করেছিলেন। কিন্তু মধুসূদন ছিলেন অনড়। অভিনেত্রী নিয়োগের প্রস্ড়াব গৃহীত হলে ক্রুদ্ধ বিদ্যাসাগর থিয়েটারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন করেন। সেকালের রক্ষণশীল সমাজ ভাবতেই পারত না যে থিয়েটারে মেয়েরা অভিনয় করবে। পুরষ অভিনেতারাও সমাজে সম্মানের স্থানে ছিলেন না। মেয়েদের গান গাওয়াও নিষিদ্ধ ছিল। সেই সমাজে থিয়েটারে অভিনেত্রী নিয়োগের পক্ষে অবস্থান নেওয়া সন্দেহাতীতভাবে এক অগ্রবর্তী ভাবনা ছিল। https://www.sahos24.com/biography

এ পর্যায়ে আমরা তাঁর নাটক নিয়ে আলোচনা করব।

শর্মিষ্ঠা

বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক নাটক মাইকেল মধুসূদন দত্তের *শর্মিষ্ঠা*। এটি রচিত হয় ১৮৫৯ সালে। নাটকটি মহাভারতের কাহিনিকে উপজীব্য করে পাশ্চাত্যরীতিতে রচিত হয়। মহাভারতের আদিপর্বে বর্ণিত রাজা যযাতি, শর্মিষ্ঠা ও দেবযানির ত্রিকোণ প্রেমের কাহিনি এই নাটকের মৌল বিষয়। মাইকেল মধুসূদন দত্তের এই নাটকটি সাফল্যের সাথে পাইকপাড়া বেলগাছিয়া নাট্যমঞ্চে মঞ্চায়িত হয়। এটি উৎসর্গ করা হয়েছে মহাকবি কালিদাসকে। ১৮৫৯ সালে নাট্যকার নিজেই ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। নাটকটি শিল্পগুণ আলোচনা করার পূর্বে নাটকটির কাহিনিসংক্ষেপ প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে চাই।

অসুর রাজের একমাত্র কন্যা শর্মিষ্ঠা এবং দৈত্যগুরু মহর্ষি শুক্রাচার্যের একমাত্র কন্যা দেবযানি পরস্পরের বাল্যসখী। ঘটনাচক্রে তাদের মধ্যে বিবাদ হলে বাদানুবাদের এক পর্যায়ে শর্মিষ্ঠা দেবযানিকে একটি কূপে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। একমাত্র কন্যার এই পরিণতির বিষয়ে জ্ঞাত হয়ে শুক্রাচার্য ক্রোধান্ধ হয়ে গেলে অসুররাজ্যকে রক্ষা করতে এবং দৈত্যগুরুর ক্রোধাগ্নিকে প্রশমিত করতে মহর্ষি নির্ধারিত শাস্তি মেনে নিয়ে শর্মিষ্ঠাকে সারাজীবনের জন্য গুরুকন্যা দেবযানির দাসত্ব বরণ করতে হয়। অপরদিকে যখন কূপে নিক্ষিপ্ত দেবযানি

বাঁচার জন্য আকুতি করছিল তখন সেখান দিয়ে অতিক্রম করছিলেন চন্দ্রবংশীয় রাজা যযাতি। দেবযানির আর্তনাদে রাজা দেবযানিকে সেই পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার করেন। ঘটনাস্থলেই উভয়ে উভয়ের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। দেবযানির পরিচয় জেনে রাজা অনতিবিলম্বে সেই স্থান পরিত্যাগ করেন। দেবযানির পিতা শুক্রাচার্য সাধনালব্ধ জ্ঞানের দ্বারা আগে থেকেই কন্যার ক্ষত্রিয়কুলে বিবাহের বিষয়ে পূর্বাভাস পেয়েছিলেন বিধায় স্বীয় কন্যা দেবযানির সখী পূর্ণিকার মাধ্যমে রাজার প্রতি দেবযানির আসক্তির বিষয়ে অবগত হয়ে স্বীয় শিষ্য কপিলের মাধ্যমে রাজা যযাতির নিকট কন্যা দেবযানির বিবাহের প্রস্ড়াব প্রেরণ করেন। রাজা এবং দেবযানি উভয়ের সম্মতিতেই তারা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন এবং সুখে দিনাতিপাত করতে থাকে। স্বল্পকালের ব্যবধানেই দেবযানির ঘর আলো করে জন্মলাভ করে এক পুত্রসন্তান। দেবযানির সাথে দৈত্যকুল হতে শর্মিষ্ঠা দেবযানির দাসী হিসেবে রাজা যযাতির রাজধানী প্রতিষ্ঠানপুরীতে আসে। ঘটনাচক্রে রাজা যযাতির সাথে দাসীরূপী শর্মিষ্ঠার সাথে রাজা যযাতির সাক্ষাৎ হয় এবং রাজা ও শর্মিষ্ঠা পরস্পরের প্রতি আকর্ষিত হন। আলাপচারিতায় রাজা শর্মিষ্ঠার প্রকৃত পরিচয় জানতে পারেন। রাজা এবং যযাতি গন্ধর্বমতে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। কিন্তু বিষয়টি দেবযানির নিকট গোপন রাখা হয়।

সময়ের পরিক্রমায় শর্মিষ্ঠার গর্ভে ৩ জন পুত্রসন্তানের জন্ম হয়। একদিন রাজা রাজমহিষী দেবযানির সাথে বাগানে পরিক্রমণকালে শর্মিষ্ঠার সন্তানদের শিশুসুলভ সরলতার কারণে রাজা ও শর্মিষ্ঠা গোপন প্রণয় সম্পর্কে অবগত হয়ে ক্রোধান্ধ হয়ে রাজধানী এবং রাজাকে পরিত্যাগ করে সকলের অজ্ঞাতসারে স্বীয় অনুচরী পূর্ণিকার সাথে দৈত্যরাজ্যের উদ্দেশে যাত্রা করে।

অপরদিকে, বিবাহোত্তর সময়ে বহুকাল কন্যার সাক্ষাৎ না পেয়ে কন্যাবৎসল পিতা দেবগুরু শুক্রাচার্য প্রতিষ্ঠানপুরীর উদ্দেশে যাত্রা করে। পথিমধ্যে দেবযানির সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। কন্যার পাগলপ্রায় ক্রোধান্ধ মূর্তি দেখে তিনি প্রকৃত তথ্য জানতে পেরে দেবযানিকে

শান্ড় করার প্রয়াস চালিয়ে ব্যর্থ হন। পিতা দৈত্যগুর“ রাজা যযাতিকে অভিশাপ না দিলে দেবযানি দেহত্যাগ করবে এইরূপ শর্তারোপ করলে দৈত্যগুর“ বাধ্য হয়ে যযাতিকে জরাগ্রস্ত হওয়ার অভিশাপ প্রদান করেন। পিতৃতুল্য ঋষিশ্রেষ্ঠ শুক্রাচার্যের অব্যর্থ অভিশাপে রাজা যযাতি জরাগ্রস্ত হয়ে পরমকষ্টে দিনাতিপাত করতে থাকে। অনুচর পূর্ণিকার কথায় দেবযানি স্বীয় ক্রোধান্ধ সিদ্ধান্ড়ে অনুতপ্ত হয়ে পিতার কাছে অভিশাপমোচনের উপায় সম্পর্কে জানতে চাইলে দৈত্যগুরু জানান যে যযাতির কোনো পুত্র পিতার অভিশাপ বরণ করলে রাজার শাপমোচন ঘটবে। শেষাবধি দেবযানির দুই পুত্র এবং শর্মিষ্ঠার বড় দুই পুত্র পিতার অভিশাপ বরণে অস্বীকৃতি জানালে রাজা তাদের প্রতি রুষ্ট হন। অবশেষে শর্মিষ্ঠার কনিষ্ঠ পুত্র পুরু সানন্দচিত্তে পিতার অভিশাপ বরণ করলে রাজা জরামুক্ত হন এবং পুত্র পুর“কে সসাগরা এবং সন্দ্বীপা পৃথিবীর একচ্ছত্র অধিপতি হওয়ার আশীর্বাদ প্রদান করেন। সর্বশেষে, দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য শর্মিষ্ঠাকে শাস্তি মুক্ত করেন এবং দেবযানি সপত্নী শর্মিষ্ঠাকে বরণ করে নেয় এবং নাটকের শুভ সমাপ্তি হয়।

চরিত্র পরিচিতি

শর্মিষ্ঠা : দৈত্যরাজের কন্যা।
দেবযানি : দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের একমাত্র কন্যা।
যযাতি : চন্দ্রবংশীয় রাজা।
কপিল : দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের শিষ্য।
পূর্ণিকা : দেবযানির একান্ত সহচরী।
পুরু : রাজা যযাতির কনিষ্ঠ পুত্র।
শুক্রাচার্য : দৈত্যগুরু।

কৃষ্ণকুমারী

কৃষ্ণকুমারী (১৮৬১) মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ট্র্যাজেডি নাটক। নাটকটির কাহিনি উইলিয়াম টডের 'রাজস্থান' নামক গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত হয়েছে। এই নাটকের

উল্লেখযোগ্য চরিত্রগুলো হলো : কৃষ্ণকুমারী, মদনিকা, বিলাসবতী, ভীমসিংহ, জগৎসিংহ, মানসিংহ, ধনদাস প্রমুখ। নাটকটি ১৮৬০ সালে রচিত হলেও প্রকাশিত হয় ১৮৬১ সালে। মাইকেল মধুসূদন দত্তের কৃষ্ণকুমারী নাটকে নায়িকা চরিত্রে অভিনয় করেন কৃষ্ণকুমারী নিজে। নাটকে কাহিনি প্রবাহিত হয় মদনিকা এবং ধনদাস চরিত্রের মাধ্যমে। নাটকের মূল বিষয়বস্তু হলো কৃষ্ণকুমারীর নিজের জীবন বিসর্জন প্রসঙ্গটি। কৃষ্ণকুমারী রূপে গুণে অনন্যা। তার একটি চিত্রপট দেখে জগৎসিংহ তাকে বিবাহ করার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়ে। ধনদাসের মাধ্যমে ভীমসিংহের কাছে রাজা জগৎসিংহ কৃষ্ণার বিবাহের পয়গাম পাঠান। ধনদাস এই নাটকে একটি হীন চরিত্র সে টাকার জন্য সব করতে পারে। নাটকের মদনিকা চরিত্র হলো বিলাসবতীর সখী। ধনদাস হলো জগৎসিংহের নারী সংগ্রহকা। নাটকটি বিশ্লেষণের পূর্বে কাহিনিসংক্ষেপ উল্লেখ করা যায়।

নাটকে কাহিনি শুরু রাজা ভীমসিংহ ১৭৭৮–১৮২৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত মেবারের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সম্রাটরূপে তাকে যেভাবে ভাগ্য বিরূপের শিকার হতে হয়েছে। তেমনি হত হয়েছে পিতা হিসেবেও। এটাই নাটকের মূল। শেলরাজ ভীমসিংহ। ভীমসিংহের বংশীয় গৌরব ছিল অনেক আগে থেকেই। কিন্তু মহারাষ্ট্র তার ওপর এমনভাবে চেপে বসে আছে। তাতে তার অর্থবিত্ত ও শক্তিতে সে দুর্বল হয়। ভীমসিংহের একমাত্র যুবতি কন্যা কৃষ্ণকুমারী। সে অতিশয় রূপবতী। উদয়পুরের রাজা জগৎসিংহের অনুচর ধনদাস টাকার লোভে তার কাছে কৃষ্ণকুমারীর ছবি বিক্রি করে, বিশ সহস্র মুদ্রা সংগ্রহ করে। এবং রাজাকে কৃষ্ণার দিকে ধাবিত করে। রাজা পক্ষ থেকে ধনদাস ভীমসিংহের কাছে বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে যায়। কিন্তু জয়সিংহ-এর রক্ষিতা বিলাসবতী তাকে ভালোবাসে। সে কৃষ্ণকে বিয়ে করবে শুনে কেঁদে বুক ভাসায়। এ কথা জানতে পারে তার সখী মদনিকা। এবং সে কৌশল করে মরুদেশীয় রাজা মানসিংহের কাছে পত্র পাঠায় এই বলে, কৃষ্ণ মানসিংহকে ভালোবাসে। জয়সিংহ জোর করে কৃষ্ণাকে বিয়ে করতে চায়। মানসিংহ যেন তার হাত হতে কৃষ্ণাকে রক্ষা করে। সে ছদ্মবেশে হাজির হয় কৃষ্ণার কাছে। এবং নিজেকে মানসিংহের দূতী

বলে পরিচয় দেয়। সে তাকে এক পুরুষের চিত্র দেখিয়ে বলে এটা মানসিংহ। মানসিংহ তাকে বিয়ে করতে চায়। ছবি দেখে কৃষ্ণা পছন্দ করে। এদিকে ভীমসিংহ ধনদাসের কথা শুনে রাজি হয়, জয়সিংহ ও কৃষ্ণকুমারীর বিয়ে দিতে। তখন মরুদেশীয় রাজা হতে খবর আসে। রাজা এটাও জানতে পারেন কৃষ্ণা মানসিংহতে অনুরক্তা। এটা জেনে তিনি ধনদাসকে ফেরত পাঠান। এতে জয়সিংহ রাগান্বিত হয়ে আবার খবর পাঠান যদি কৃষ্ণাকে তার সাথে বিয়ে দেওয়া না হয়, তবে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে। আবার মানসিংহও এই হুমকি দেয়। ভীমসিংহ বুঝতে পারেন, তার মেয়েকে যে রাজার কাছেই বিয়ে দেন না কেন অন্য রাজা যুদ্ধ ঘোষণা করবেন। এমন অবস্থায় যুদ্ধ ঘোষণা দিলে তিনি তা রুখে দাঁড়াবার শক্তি সঞ্চয় করতে পারবেন না। কেননা তার রাজ্যভান্ডার রিক্ত। তিনি এক অসহায় রাজা এবং পিতা হয়ে মুহ্যমান হন। কী হবে এর পরিণতি। কৃষ্ণকুমারী নাটকের কাহিনি ইতিহাসের হলেও লেখক তাকে রোমান্টিক ট্র্যাজেডি রূপে দিয়েছেন।

কৃষ্ণকুমারী নাটকে চরিত্রচিত্রণে নাট্যকার নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। নাটকের মূল কাহিনিতে ট্র্যাজেডি রূপ পরিলক্ষিত না হলেও নাট্যকার এতে তা আরোপ করেছেন। নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র ভীমসিংহ ও কৃষ্ণকুমারী। জগৎসিংহ এখানে স্থূলকামরুচিতে মত্ত। তবে সেটা ধনদাসের কারণে। বিলাসবতীকে ধনদাসই বারবনিতা বানায়। মদনিকা সখীর কষ্ট সহ্য করতে পারেনি। কৃষ্ণকুমারী পিতার অনুগত কন্যা। তাছাড়াও বলেন্দ্রসিংহ, সত্যদাস, মহিষী অহল্যা অন্যতম চরিত্র।